আল 'আনকাবূত

২৯

নামকরণ

একচল্লিশ আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে 'আনকাবূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা।

নাযিল হবার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরাতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তুগুলোর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রকাশ হয় মদীনায়, সেহেতু কোন কোন মুফাস্সির ধারণা করে নিয়েছেন যে, সূরাটির প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরাত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোন কোন মুফাস্সির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন। অথচ মদীনায় হিজরাতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরাত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরাত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ–মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম–নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি করার এবং অন্যদিকে দুর্বল ঈমানদারদেরকে লজ্জা দেবার জন্য

এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কার কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাঁদের পিতা–মাতারা তাঁদের ওপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ত্যাগ করে তাদের দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাঁদের পিতা–মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো একথাই লেখা আছে যে, মা–বাপের হক সবচেয়ে বেশী। কাজেই আমরা যাকিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এ জন্য আযাব–সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এ জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবো ঃ জনাব, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২–১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো, তাঁরা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়–কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরী হয়, তাহলে তাতে আর কোনদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদের এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম–নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শির্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্ব–জাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নিদর্শনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

الٓمٓ ۝١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِينَ ۝٣

আলিফ–লাম–মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?[১] অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি[২] আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন[৩] কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

১. যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আয্‌যমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম–নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন–নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি–রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে অনাহারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের কোন ব্যক্তি হতো, তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থা মক্কায় একটি মারাত্মক ভীতি ও আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো এবং কিছু লোক ঈমান আনার পর ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা হয়ে কাফেরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ তাঁদের গ্রন্থে। তিনি বলেন, যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল। আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে–উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মু'মিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ–প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।"

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে বুঝান, ইহ্কালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। তাকে এভাবে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এত সস্তা নয় এবং দুনিয়াতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত আয়াসলব্ধ নয় যে, তোমরা কেবলি মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দান করে দেবো। এসবের জন্য তো পরীক্ষার শর্ত রয়েছে। আমার জন্য কষ্ট বরদাশত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন–নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, বিপদ–মুসীবত ও সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশংকা দিয়েও পরীক্ষা করা হবে এবং লোভ–লালসা দিয়েও। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এমন প্রত্যেকটি কষ্ট যা তোমাদের অনভিপ্রেত এবং তোমরা অপছন্দ করে থাকো, আমার জন্য তা অবশ্যই বরদাশ্ত করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমাকে মানার যে দাবী করেছিলে তার সত্য–মিথ্যা যাচাই হবে। কুরআন মজীদের এমন প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে বিপদ–মুসীবত ও নিগ্রহ–নিপীড়নের সর্বব্যাপী আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা হয়ে গেছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে। হিজরাতের পরে মদীনায় মুসলমানদের জীবনের প্রথমাবস্থায় যখন অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের ভিতরের দুষ্কৃতি মু'মিনদেরকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল তখন আল্লাহ বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী

(ঈমানদার) গণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ–ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

(আল বাকারাহ, ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহোদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের ওপর আবার বিপদ–মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয় ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" (আলে ইমরান, ১৪২)

প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। ভেজাল নিজে নিজেই আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং নির্ভেজালকে বাছাই করে নিয়ে নেয়া হয়। এভাবে সে আল্লাহর এমনসব পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়, যেগুলো কেবলমাত্র সাচ্চা ঈমানদারদের জন্যই নির্ধারিত।

২. অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে?

৩. মূল শব্দ হচ্ছে فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন" একথায় কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ তো সত্যবাদীর সত্যবাদিতা এবং মিথ্যুকের মিথ্যাচার ভালোই জানেন, পরীক্ষা করে আবার তা জানার প্রয়োজন কেন? এর জবাব হচ্ছে, যতক্ষণ এক ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিসের কেবলমাত্র যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাই থাকে, কার্যত তার প্রকাশ হয় না ততক্ষণ ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে সে কোন পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে এবং অন্যজনের মধ্যে যোগ্যতা আছে আত্মসাত করার। এরা দু'জন যতক্ষণ না পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং একজনের থেকে আমানতদারী এবং অন্যজনের থেকে আত্মসাতের কার্যত প্রকাশ না ঘটে ততক্ষণ নিছক নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ একজনকে আমানতদারীর পুরস্কার দিয়ে দেবেন এবং অন্যজনকে আত্মসাতের শাস্তি দিয়ে দেবেন, এটা তাঁর ইনসাফের বিরোধী। তাই মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ করার আগে তাদের কর্মযোগ্যতা ও ভবিষ্যত কর্মনীতি সম্পর্কে আল্লাহর যে পূর্ব

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ ⑥

আর যারা খারাপ কাজ করছে[৪] তারা কি মনে করে বসেছে তারা আমার থেকে এগিয়ে চলে যাবে?[৫] বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করছে।

যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আশা করে (তার জানা উচিত), আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই।[৬] আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৭] যে ব্যক্তিই প্রচেষ্টা-সংগ্রাম করবে সে নিজের ভালোর জন্যই করবে।[৮] আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষিতাহীন।[৯]

জ্ঞান আছে তা ইনসাফের দাবী পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। অমুক ব্যক্তির মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে, সে চুরি করবে অথবা করতে যাচ্ছে, এ ধরনের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ বিচার করেন না। বরং সে চুরি করেছে—এ জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি বিচার করেন। এভাবে অমুক ব্যক্তি উন্নত পর্যায়ের মু'মিন ও মুজাহিদ হতে পারে অথবা হবে এ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তার ওপর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করেন না বরং অমুক ব্যক্তি নিজের কাজের মাধ্যমে তার সাচ্চা ঈমানদার হবার কথা প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জীবন সংগ্রাম করে দেখিয়ে দিয়েছে—এরি ভিত্তিতে বর্ষণ করেন। তাই আমি এ আয়াতের অনুবাদ করেছি "আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন।"

৪. যদিও আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত সকলের উদ্দেশ্যে এখানে বলা হতে পারে তবুও বিশেষভাবে এখানে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে, কুরাইশদের সেই জালেম নেতৃবর্গ যারা ইসলামের বিরোধিতায় নেমে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর নিগ্রহ চালাবার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল, যেমন ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল, উতবাহ, শাইবাহ, উক্বাহ ইবনে আবু মু'আইত, হানযালা ইবনে ওয়াইল এবং আরো অনেকে। এখানে পূর্বাপর বক্তব্যের স্বতস্ফূর্ত দাবী এই যে, পরীক্ষা তথা বিপদ-মুসীবত ও জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দেবার পর এ সত্যপন্থীদের ওপর যারা জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে সম্বোধন করে ভীতি ও হুমকিমূলক কিছু কথাও বলা হোক।

৫. এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" মূল শব্দ হচ্ছে يَسْبِقُونَا অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই (অর্থাৎ আমার রসূলের মিশনের

সাফল্য) তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় (অর্থাৎ আমার রসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করা) তা করতে তাদের সফল হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাদের বাড়াবাড়ির জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাই এবং তারা পালিয়ে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব–নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ–অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন–কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই।

৮. "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব–সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব–সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা–আকাংখার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব–সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম–রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা–সংগ্রাম এক–দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন–রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন :

ان الرجل ليجاهد وماضرب يوما من الدهر بسيف

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমি তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর প্রতিদান দেবো।[১০]

"মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না।"

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব–সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তোমাদের এ যুদ্ধ ছাড়া তাঁর ইলাহী শাসন চলবে না, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব–সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথেই তোমরা দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতার ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের হয়ে সৎকর্মশীলতা ও সত্যতার পথে চলতে পারবে। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং পরকালে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহ্র কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে।

১০. ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা–কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক–ইনসাফ ও সত্য–সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কন্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহ্র আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অংগ–প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুই ঃ তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল–ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۞

আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কোন (মা'বুদকে) আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না।[১১] *আমার দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কি করছিলে।*[১২] *আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করে থাকবে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের অন্তরভূক্ত করবো।*

ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে ঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশী ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।"

(১৬০ আয়াত)

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।"

সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا

"আল্লাহ্ তো কণামাত্রও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

১১. এ আয়াতটি সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা হচ্ছে, এটি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস-এর ব্যাপারে নাযিল হয়। তাঁর বয়স যখন আঠারো উনিশ বছর তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মা হাম্না বিনতে সুফিয়ান (আবু সুফিয়ানের ভাইঝি) যখন জানতে পারে যে, তার ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে তখন সে বলে, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে ততক্ষণ আমি কিছুই পানাহার করবো না এবং ছায়াতেও বসবো না। মায়ের হক আদায় করা তো আল্লাহর হুকুম। কাজেই তুমি আমার কথা না মানলে আল্লাহরও নাফরমানী করবে। একথায় হযরত সা'দ অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়। মক্কা মুআয্যমার প্রথম যুগে যেসব যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হতে পারে তারাও একই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাই সূরা লুকমানেও পূর্ণ শক্তিতে এ বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। (দেখুন ১৫ আয়াত)

আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের ওপর মা-বাপের হক হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই মা-বাপই যদি মানুষকে শির্ক করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনে নেয়া উচিত নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অন্য কারো কথায় মানুষের এ ধরনের শিরক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর শব্দগুলি হচ্ছে : وَإِنْ جَاهَدَاكَ "যদি তারা দু'জন তোমাকে বাধ্য করার জন্য তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে" এ থেকে জানা গেলো, কম পর্যায়ের চাপ প্রয়োগ বা বাপ-মায়ের মধ্য থেকে কোন একজনের চাপ প্রয়োগ আরো সহজে প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। এই সংগে مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না) বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

১২. অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের অধিকার কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾

লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি[১৩] কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহিত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে।[১৪] এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।"[১৫] বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ্ ভালোভাবে জানেন না? আর আল্লাহ্ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক।[১৬]

হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথ ভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

১৩. যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি।" ইমাম রাযী এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি বলেন, মুনাফিক সবসময় নিজেকে মু'মিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মু'মিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও কারানির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে মরে যাবার পর কুফরীর অপরাধে যে জাহান্নামের আযাব

ভোগ করতে হবে আল্লাহর সেই জাহান্নামের আযাব কিছুটা এ ধরনেরই হবে। তাই সে সিদ্ধান্ত করে, সে আযাব তো পরে ভোগ করবো কিন্তু এখন এ নগদ আযাব যা পাচ্ছি তার হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য আমাকে ঈমান ত্যাগ করে কুফরীর মধ্যে চলে যাওয়া উচিত। এভাবে দুনিয়ার জীবনটাতো নিশ্চিন্তে আরামের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

১৫. অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয় কিন্তু যখন এ দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়–দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলমানদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি।

এ প্রসংগে আরো এতটুকু কথা জেনে রাখতে হবে যে, অসহনীয় নিপীড়ন, ক্ষতি বা মারাত্মক ভীতিজনক অবস্থায় কোন ব্যক্তির কুফরী কথা বলে নিজেকে রক্ষা করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তরিকতা সহকারে ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু যে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি অক্ষম অবস্থায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরীর প্রকাশ করে এবং যে সুবিধাবাদী লোকটি আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে ইসলামকে সত্য জানে এবং সে হিসেবে তাকে মানে কিন্তু ঈমানী জীবনধারার বিপদ ও বিঘ্ন–বিপত্তি দেখে কাফেরদের সাথে হাত মিলায় তাদের দু'জনের মধ্যে ফারাকটি অনেক বড়। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দু'জনের অবস্থা পরস্পর থেকে কিছু বেশী ভিন্ন মনে হবে না কিন্তু আসলে যে জিনিসটি তাদের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে এই যে, বাধ্য হয়ে কুফরীর প্রকাশকারী আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানটি কেবলমাত্র আকীদার দিক দিয়ে ইসলামের ভক্ত থাকে না বরং কার্যতও তার আন্তরিক সহানুভূতি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই থাকে। তাদের সাফল্যে সে খুশী হয় এবং তাদের ব্যর্থতা তাকে অস্থির করে তোলে। অক্ষম অবস্থায়ও সে মুসলমানদের সাহায্য করার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তার ওপর ইসলামের শত্রুদের বাঁধন যখনই ঢিলে হয়ে যায় সংগে সংগেই সে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, এ সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকে সে। পক্ষান্তরে সুযোগ সন্ধানী লোক যখনই দেখে ইসলামের পথ কঠিন হয়ে গেছে এবং খুব ভালভাবে মাপজোক করে দেখে নেয়, ইসলামের সহযোগী হবার ক্ষতি কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করার লাভের চেয়ে বেশী তখনই সে নিছক নিরাপত্তা ও লাভের খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষে তাদের জন্য এমন কোন কাজ করতে সে পিছপাও হয় না যা ইসলামের মারাত্মক বিরোধী এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এই সাথে হয়তো কোন সময় ইসলামের বিজয় সাধিত হতে পারে, এ সম্ভাবনার দিক থেকেও সে একেবারে চোখ বন্ধ করে রাখে না। তাই যখনই মুসলমানদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় তখনই সে তাদের আদর্শকে সত্য বলে মেনে নেবার, তাদের সামনে নিজের ঈমানের অংগীকার করার এবং সত্যের পথে ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য তাদেরকে বাহবা দেবার ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করে না। এ মৌখিক

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ⑫ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ⑬

এ কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো এবং আমরা তোমাদের গোনাহখাতাগুলো নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো,[১৭] অথচ তাদের গোনাহখাতার কিছুই তারা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে না,[১৮] তারা ডাহা মিথ্যা বলছে। হাঁ নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বোঝাও বইবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্য অনেক বোঝাও।[১৯] আর তারা যে মিথ্যাচার চালিয়ে এসেছে কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[২০]

স্বীকৃতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনের সময় সে তাকে কাজে লাগাতে চায়। কুরআন মজীদ অন্য এক জায়গায় মুনাফিকদের এ বেনিয়া মানসিকতাকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে (অর্থাৎ দেখছে অবস্থা কোন্দিকে মোড় নেয়)। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়, তাহলে এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে, তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না এবং এরপরও তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাইনি? (আন নিসা, ১৪১)

১৬. অর্থাৎ মু'মিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যাকিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ্ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। একথাটিই সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"আল্লাহ মু'মিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো)। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" (১৭৯ আয়াত)

১৭. তাদের এ উক্তির অর্থ ছিল, প্রথমত মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরস্কারের এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি পরকালের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের ধর্মের দিকে ফিরে এসো। হাদীসে বিভিন্ন কুরাইশ সরদার সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাত করে এ সরদাররা এমনি ধরনের কথা বলতো। তাই হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন তিনি ঈমান আনেন, আবু সুফিয়ান ও হারব্ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্‌ফও তাঁর সাথে সাক্ষাত করে একথাই বলেছিল।

১৮. অর্থাৎ প্রথমত এটা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অন্যের দায়-দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে পারে না এবং কারো বলার কারণে গোনাহকারী নিজের গোনাহের শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কারণ সেখানে তো প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না) কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি এমনটি হয়ও, তাহলে যে সময় কুফরী ও শিরকের পরিণতি একটি প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের আকারে সামনে এসে যাবে তখন কার এত বড় বুকের পাটা হবে যে, সে দুনিয়ায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসে বলবে, জনাব! আমার কথায় যে ব্যক্তি ঈমান ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিল আপনি তাকে মাফ করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিন এবং আমি জাহান্নামে নিজের কুফরীর সাথে সাথে তার কুফরীর শাস্তিও ভোগ করতে প্রস্তুত আছি।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে যদিও তারা নিজেদের বোঝার সাথে অন্যের বোঝা বইবে না কিন্তু দ্বিগুণ বোঝা উঠানোর হাত থেকে নিষ্কৃতিও পাবে না। তাদের ওপর চাপবে তাদের নিজেদের গোমরাহ হবার একটি বোঝা। আর দ্বিতীয় একটি বোঝাও তাদের ওপর চাপানো হবে অন্যদের গোমরাহ করার। একথাটিকে এভাবে বলা যায়, এক ব্যক্তি নিজেও চুরি করে এবং অন্য ব্যক্তিকেও তার সাথে এ কাজে অংশ নিতে বলে। এখন যদি এ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কথায় চুরি করায় অংশ নেয়, তাহলে অন্যের কথায় অপরাধ করেছে বলে কোন আদালত তাকে ক্ষমা করে দেবে না। চুরির শাস্তি অবশ্যই সে পাবে। ন্যায় বিচারের কোন নীতি অনুযায়ী তাকে রেহাই দিয়ে তার পরিবর্তে এ শাস্তি সেই প্রথম চোরটি যে তাকে ধোঁকা দিয়ে চৌর্যবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না। কিন্তু সেই প্রথম চোরটি তার নিজের অপরাধের সাথে সাথে অন্যজনকে চোরে পরিণত করার অপরাধের শাস্তিও পাবে। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۔

"যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।" (আন নাহল, ২৫)

আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন ঃ

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا

"যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহবান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্য কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।" (মুসলিম)

২০. 'মিথ্যাচার' মানে এমন সব মিথ্যা কথা যা কাফেরদের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে লুকিয়ে ছিল ঃ "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহখাতাগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।" আসলে দু'টি বানোয়াট চিন্তার ভিত্তিতে তারা একথা বলতো। একটি হচ্ছে, তারা যে শিরকীয় ধর্মের অনুসরণ করে চলছে তা সত্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদী ধর্ম মিথ্যা। আর দ্বিতীয় বানোয়াট চিন্তাটি হচ্ছে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না এবং পরকালের জীবনের এ ধ্যান–ধারণা যার কারণে একজন মুসলমান কুফরী করতে ভয় পায়, এটা একেবারেই অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। এ বানোয়াট চিন্তা নিজেদের মনে পোষণ করার পর তারা একজন মুসলমানকে বলতো, ঠিক আছে, তোমাদের মতে কুফরী করা যদি গোনাহই হয় এবং কোন কিয়ামতও যদি অনুষ্ঠিত হবার থাকে যেখানে এ গোনাহের কারণে তোমাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে আমরা তোমাদের এ গোনাহ নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছি, আমাদের দায়িত্বে তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে এসো। এ ব্যাপারের সাথে আরো দু'টি মিথ্যা কথাও জড়িত ছিল। তার একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্যের কথায় কোন অপরাধ করে সে নিজের অপরাধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে এবং যার কথায় সে এ অপরাধ করে সে এর পূর্ণ দায়ভার উঠাতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যথার্থই তাদের দায়ভার মাথায় তুলে নেবে, যারা তাদের কথায় ঈমান পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে ফিরে গিয়েছিল। কারণ, যখন কিয়ামত সত্যি সত্যি কায়েম হয়ে যাবে

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۖ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই[২১] এবং সে তাদের মধ্যে থাকে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর।[২২] শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অবস্থায় যখন তারা জালেম ছিল।[২৩] তারপর আমি নূহকে ও নৌকা আরোহীদেরকে[২৪] রক্ষা করি এবং একে বিশ্ববাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন করে রাখি।[২৫]

এবং তাদের আশা-আকাংখার বিরুদ্ধে জাহান্নাম তাদের চোখের সামনে বিরাজ করবে। তখন তারা কখনোই নিজেদের কুফরীর শাস্তি পাওয়ার সাথে সাথে যাদেরকে তারা দুনিয়ায় ধোঁকা দিয়ে গোমরাহ করতো তাদের গোনাহের সমস্ত বোঝাও নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিতে রাজি হবে না।

২১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩৩-৩৪; আন নিসা, ১৬৩; আল আন'আম, ৮৪; আল আ'রাফ, ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ ও ৭৩; হূদ, ২৫ ও ৪৮; আল আম্বিয়া, ৭৬ ও ৭৭; আল মু'মিনূন, ২৩ ও ৩০; আল ফুরকান, ৩৭; আশ্ শূআরা, ১০৫ থেকে ১২৩; আস্ সাফ্ফাত, ৭৫ ও ৮২; আল কামার, ৯০; আল হাক্কাহ, ১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

যে পটভূমিতে এখানে এ কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে হলে সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানে একদিকে মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের আগে যেসব মু'মিন অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আমি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি। অন্যদিকে জালেম কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে এবং আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। এ দু'টি কথা উপলব্ধি করার জন্য এ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

২২. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত নূহের বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। বরং এর অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের দায়িত্বলাভ করার পর থেকে মহাপ্লাবন পর্যন্ত সাড়ে ন'শো বছর হযরত নূহ এই জালেম ও গোমরাহ জাতির সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন এবং এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জুলুম-নির্যাতন বরদাশ্‌ত করার পরও তিনি হিম্মতহারা হননি। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা

বরদাশত করে চলছো কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে ন'শো বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো।

হযরত নূহের বয়সের ব্যাপারে কুরআন মজীদ ও বাইবেলের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। বাইবেল বলে, তাঁর বয়স ছিল সাড়ে ন'শো বছর। তাঁর বয়স যখন ছ'শো বছর তখন প্লাবন আসে। এরপর তিনি আর সাড়ে তিনশো বছর জীবিত থাকেন। (আদি পুস্তক ৭ ঃ ৬, ৯ ঃ ২৮–২৯) কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স অন্তত এক হাজার বছর হওয়া উচিত। কারণ সাড়ে ন'শো বছর তো হচ্ছে শুধুমাত্র নবুওয়াতের দায়িত্বে আসীন হবার পর থেকে নিয়ে প্লাবন শুরু হওয়া পর্যন্তকার সময়টি। এ সময়–কালটি তিনি ব্যয় করেন দীনের দাওয়াত দেবার ও তার প্রচারের কাজে। একথা সুস্পষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি পরিপক্কতা অর্জন করেছেন এমন এক বয়সেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন এবং প্লাবনের পরও তিনি কিছুকাল জীবিত থেকে থাকবেন।

এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এ বিশ্বে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অভাব নেই। যেদিকেই তাকানো যাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আকারে দৃষ্টিগোচর হবে। কিছু ঘটনা ও অবস্থার প্রথমত একটি বিশেষ আকারে আত্মপ্রকাশ করে যেতে থাকাটা এমন কোন যুক্তি পেশ করে না যার ফলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় ভিন্নধর্মী কোন ঘটনা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এ পর্যায়ের ধারণাগুলোর ভিত ধসিয়ে দেবার জন্য বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন স্থানে এবং সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রজাতির মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হবার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে সে কখনো জীবন মৃত্যুর স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষে কোন মানুষকে এক হাজার বছর বা তার চেয়ে কম–বেশী বয়স দান করা সম্ভব নয়, এ ধরনের কোন ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে না। আসলে মানুষ নিজে চাইলেও এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ চাইলে যতদিন যত বছর চান তাকে জীবিত রাখতে পারেন।

২৩. অর্থাৎ তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। অন্য কথায়, যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের জুলুম–নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না।

২৪. অর্থাৎ যারা হযরত নূহের (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং যাদেরকে আল্লাহ নৌকায় আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূরা হূদে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ، قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ، وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ –

وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾

আর ইবরাহীমকে পাঠাই[২৬] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁকে ভয় করো।[২৭] এটা তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা জানো। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারাতো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করছো।[২৮] আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করো তারা তোমাদের কোন রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[২৯] আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ করো, তাহলে পূর্বে বহু জাতি মিথ্যা আরোপ করেছে[৩০] এবং রসূলের ওপর পরিষ্কারভাবে পয়গাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।"

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো তখন আমি বললাম, (হে নূহ) এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর (প্রাণীদের) এক এক জোড়া এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে। তবে যাদেরকে সংগে না নেবার জন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কথা আলাদা। আর তার সাথে ঈমান এনেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন।" (৪০ আয়াত)

২৫. এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়াবহ শাস্তি অথবা এ যুগান্তকারী ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এবং সূরা কামারে একথাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নিদর্শন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃংগে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। সূরা আল কামারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

"আর নূহকে আমি আরোহণ করালাম তখতা ও পেরেকের তৈরি নৌকায়। তা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম একটি নিদর্শনে পরিণত করে; কাজেই আছে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণকারী?" (১৩–১৫ আয়াত)

সূরা আল কামারের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর কাতাদার এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ সাহাবীগণের আমলে মুসলমানরা যখন আল জাযীরায় যায় তখন তারা জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি বর্ণনা মতে বাকেরওয়া নামক জনবসতির কাছে) এ নৌকাটি দেখে। বর্তমানকালে মাঝে মাঝে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে যে, নূহের নৌকা অনুসন্ধান করার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, অনেক সময় বিমান আরারাতের পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় আরোহীরা একটি পর্বতশৃংগে একটি নৌকার মতো জিনিস দেখেছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, ৪৭ এবং হূদ, ৪৬ টীকা)

২৬. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ১৫, ১৬ ও ৩৫; আলে ইমরান, ৭; আল আন'আম, ৯; হূদ, ৭; ইবরাহীম, ৬; আল হিজর, ৪; মারয়াম, ৩; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শূ'আরা, ৫; আস্ সাফ্ফাত, ৩; আয্ যুখ্রুফ, ৩ এবং আয্ যারিয়াত, ২ রুকূ' সমূহ।

২৭. অর্থাৎ তাঁর সাথে কাউকে শরীক এবং তার নাফরমানী করতে ভয় করো।

২৮. অর্থাৎ তোমরা এ মূর্তি তৈরি করছো না বরং মিথ্যা তৈরি করছো। এ মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব নিজেই একটি মূর্তিমান মিথ্যা। তার ওপর তোমাদের এ আকীদা–বিশ্বাস যে, এরা দেব–দেবী, আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ও তাঁর কাছে শাফা'আতকারী অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রোগ নিরাময়কারী আবার কেউ সন্তান–দাতা এবং কেউ রিযিকদাতা—এসবই মিথ্যা কথা। তোমরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে এসব রচনা করেছো। আসল সত্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এগুলো নিছক হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি এবং এদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই।

২৯. এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য করতে হলে এ জন্য যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে। একটি যুক্তিসংগত কারণ এ হতে পারে যে, তার নিজের সত্তার মধ্যে মাবুদ হবার কোন অধিকার থাকে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষ নিজের অস্তিত্বের জন্য তার কাছে অনুগৃহীত। তৃতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের লালন–পালনের ব্যবস্থা করে। তাকে রিযিক তথা জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করে। চতুর্থ কারণ হতে পারে, মানুষের ভবিষ্যত তার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ আশংকা করে তার অসন্তুষ্টি অর্জন করলে তার নিজের পরিণাম অশুভ হবে। হযরত ইবরাহীম বলেন, এ চারটি কারণের কোন একটিও মূর্তি পূজার পক্ষে নয়। বরং এর

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

এরা[৩১] কি কখনো লক্ষ করেনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহর জন্য সহজতর।[৩২] এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[৩৩] যাকে চান শাস্তি দেন এবং যার প্রতি চান করুণা বর্ষণ করেন, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা না পৃথিবীতে অক্ষমকারী, না আকাশে[৩৪] এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।[৩৫]

প্রত্যেকটিই নির্ভেজাল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের দাবী করে। "এ নিছক মূর্তিপূজা" বলে তিনি প্রথম কারণটিকে বিলুপ্ত করে দেন। কারণ নিছক মূর্তি মাবূদ হবার ব্যক্তিগত কি অধিকার লাভ করতে পারে? তারপর "তোমরা তাদের স্রষ্টা" একথা বলে দ্বিতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। এরপর তারা তোমাদের কোন প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, একথা বলে তৃতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। আর সবশেষে বলেন, তোমাদের তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে, এ মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে যেতে হবে না। কাজেই তোমাদের পরিণাম ও পরকালকে সমৃদ্ধ বা ধ্বংস করার ক্ষমতাও এদের নেই। এ ক্ষমতা আছে একমাত্র আল্লাহর হাতে। এভাবে শিরককে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি তাদের ওপর একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মানুষ যে সমস্ত কারণে কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য গণ্য করতে পারে তার কোনটাই এক ও লা-শারীক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদাত করার দাবী করে না।

৩০. অর্থাৎ যদি তোমরা আমার তাওহীদের দাওয়াতকে এবং তোমাদের নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে—এসব

কথাকে মিথ্যা বলো, তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। ইতিহাসে এর পূর্বেও বহু নবী (যেমন নূহ, হূদ, সালেহ আলাইহিমুস সালাম প্রমুখগণ) এ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁদের জাতিরাও তাঁদেরকে এমনিভাবেই মিথ্যুক বলেছে। এখন তারা এ নবীদেরকে মিথ্যুক বলে তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পেরেছে, না নিজেদের পরিণাম ধ্বংস করেছে, এটা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৩১. এখান থেকে নিয়ে لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) পর্যন্ত আয়াতগুলো মূল আলোচনার মাঝখানে স্বতন্ত্র প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে আনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর ধারা বর্ণনা ছিন্ন করে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথাগুলো বলেছেন। এ বিষয়ের সাথে এ প্রাসংগিক ভাষণের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মক্কার যে কাফেরদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এ ভাষণ দেয়া হচ্ছে তারা দু'টি মৌলিক গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। একটি ছিল শির্ক ও মূর্তিপূজা এবং অন্যটি ছিল আখেরাত অস্বীকৃতি। এর মধ্য থেকে প্রথম গোমরাহীকে বাতিল করা হয়েছে হযরত ইবরাহীমের ওপরে উদ্ধৃত ভাষণের মাধ্যমে। এখন দ্বিতীয় গোমরাহীটিকে বাতিল করার জন্য আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এ বাক্য কয়টি বলছেন। এভাবে একই বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে দু'টি বিষয়কেই বাতিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ একদিকে অসংখ্য বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে এবং অন্যদিকে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে আবার নতুন ব্যক্তিবর্গ অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। মুশরিকরা এসব কিছুকে আল্লাহর সৃষ্টি ও উদ্ভাবন গুণের ফল বলে মানতো। আজকের যুগের মুশরিকরা যেমন আল্লাহর স্রষ্টা হবার কথা অস্বীকার করে না তেমনি তারাও একথা অস্বীকার করতো না। তাই তাদের স্বীকৃত কথার ওপর এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যে আল্লাহ বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন এবং তারপর মাত্র একবার সৃষ্টি করে শেষ করেন না বরং তোমাদের চোখের সামনে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জায়গায় আবার একই জিনিস অনবরত সৃষ্টি করে চলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা ভাবতে পারলে যে, তোমাদের মরে যাবার পর তিনি আর পুনর্বার তোমাদের জীবিত করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না? (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নাম্ল, ৮০ টীকা)

৩৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহর শিল্পকারিতার বদৌলতে প্রথমবারের সৃষ্টি তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছো তখন তোমাদের বুঝা উচিত, একই আল্লাহর শিল্পকারিতার মাধ্যমে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কাজ করা তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয় এবং আওতা বহির্ভূত হতেও পারে না।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। তোমরা ভূগর্ভের তলদেশে কোথাও নেমে যাও অথবা আকাশের কোন উচ্চ মার্গে পৌঁছে যাও না কেন সব জায়গা থেকেই তোমাদেরকে ধরে আনা হবে এবং নিজেদের রবের সামনে হাজির করা হবে। সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٢٤

৩ রুকূ'

যারা আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে[৩৬] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তারপর[৩৭] সেই জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বললো, "একে হত্যা করো অথবা পুড়িয়ে ফেলো।"[৩৮] শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন।[৩৯] অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।[৪০]

বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ - الرحمن : ٣٣

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে। যারা শিরক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হতে অস্বীকার করেছে এবং বুক ফুলিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এং তাঁর যমীনে ব্যাপকভাবে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবের ফায়সালাকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা সমগ্র বিশ্ব-জগতে এমন একজনও নেই যে আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলার সাহস রাখে যে, এরা আমার লোক কাজেই এরা যা কিছু করেছে তা মাফ করে দেয়া হোক।

৩৬. অর্থাৎ আমার রহমতে তাদের কোন অংশ নেই। আমার অনুগ্রহের অংশ লাভের আশা করার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। একথা সুস্পষ্ট যখন তারা আল্লাহর আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করলো তখন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা

থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের লাভবান হবার অধিকার প্রত্যাহার করে নিলেন। তারপর যখন তারা আখেরাত অস্বীকার করলো এবং কখনো তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে একথা স্বীকারই করলো না তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা আল্লাহর দান ও মাগফেরাতের সাথে কোন প্রকার আশার সম্পর্ক রাখেনি। এরপর যখন নিজেদের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে তারা আখেরাতের জগতে চোখ খুলবে এবং আল্লাহর যেসব আয়াতকে তারা মিথ্যা বলেছিল সেগুলোকেও সত্য হিসেবে স্বচক্ষে দেখে নেবে তখন সেখানে আল্লাহর রহমতের অংশ লাভের প্রার্থী হবার কোন কারণ তাদের থাকতে পারে না।

৩৭. এখান থেকে বর্ণনা আবার হযরত ইবরাহীমের কাহিনীর দিকে মোড় নিচ্ছে।

৩৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের ন্যায়সংগত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কন্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা হযরত ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল, তাঁকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।

৩৯. এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, তারা শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত করেছিল। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাঁকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু সূরা আল আম্বিয়ায় পরিকার করে বলা হয়েছে : আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ বস্তু হয়ে যায়, قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ "আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।" (৬৯ আয়াত) একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁকে যদি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপই না করা হয়ে থাকতো তাহলে আগুনকে ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও এ হুকুম দেবার কোন অর্থই হয় না। এ থেকে একথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত বস্তুর ধর্ম বা প্রকৃতি মহান আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যখনই চান যে কোন বস্তুর ধর্ম ও বিশেষত্ব পরিবর্তন করতে পারেন। সাধারণভাবে আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো এবং দগ্ধীভূত হবার মতো প্রত্যেকটি জিনিসকে পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আগুনের এ ধর্ম তার নিজের প্রতিষ্ঠিত নয় বরং আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। তার এ ধর্মটি আল্লাহকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেনি যে, তিনি এর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দিতে পারেন না। তিনি নিজের আগুনের মালিক। যে কোন সময় তিনি তাকে জ্বালাবার কাজ পরিত্যাগ করার হুকুম দিতে পারেন। কোন সময় নিজের এক ইংগিতে তিনি অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করতে পারেন। এ অস্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় তাঁর রাজ্যে প্রতিদিন হয় না। কোন বড় রকমের তাৎপর্যবহ শিক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরেই হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়মমাফিক যেসব জিনিস প্রতিদিন দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেগুলোকে কোনক্রমেই এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে না যে, সেগুলোর

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

আর সে বললো,[৪১] "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে প্রীতি–ভালোবাসার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছো।[৪২] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার এবং পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করবে[৪৩] আর আগুন তোমাদের আবাস হবে এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।" সে সময় লূত তাকে মেনে নেয়[৪৪] এবং ইবরাহীমকে বলে, আমি আমার রবের দিকে হিজরাত করছি,[৪৫] তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৪৬]

মধ্যে তাঁর শক্তি আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিয়ম বিরোধী কোন ঘটনা আল্লাহর হুকুমেও সংঘটিত হতে পারে না।

৪০. এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য এ মর্মে নিদর্শন রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরিবার, বংশ, জাতি ও দেশের ধর্ম পরিত্যাগ করে যে সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি শির্কের অসারতা ও তাওহীদের সত্যতা জানতে পেরেছিলেন তারই অনুসরণ করেন। আবার এ মর্মেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি নিজ জাতির হঠকারিতা ও কঠোর জাতীয় স্বার্থ প্রীতি ও বিদ্বেষ অগ্রাহ্য করে তাকে মিথ্যার পথ থেকে সরিয়ে আনার ও সত্য গ্রহণ করার জন্য অনবরত প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তাছাড়া এ ব্যাপারেও নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি আগুনের ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুলসেরাত পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, হযরত ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবেই আল্লাহর সাহায্য তাঁর জন্য আসে এবং এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়।

৪১. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর হযরত ইবরাহীম (আ) লোকদেরকে একথা বলেন।

৪২. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছো। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্তাকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতে লোকেরা একত্র হতে পারে। আর যত বড় মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে।

৪৩. অর্থাৎ মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সামাজিক কাঠামো আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরী ও শিরক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পীর-মুরীদ পর্যন্ত একে অন্যের ওপর লানত বর্ষণ করবে এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই জালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। যেমন সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَ خِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

"বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" (৬৭ আয়াত)

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের পক্ষে বলবে ঃ হে আমাদের রব ! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" (৩৮ আয়াত)

সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ٥

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করি[৪৭] এবং তার বংশধরদের মধ্যে রেখে দিই নবুওয়াত ও কিতাব[৪৮] এবং তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিদান দিই আর আখেরাতে সে নিশ্চিতভাবেই সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে।[৪৯]

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করো।"

(৬৭-৬৮ আয়াত)

৪৪. বক্তব্যের বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে বের হয়ে আসেন এবং তিনি ওপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলেন, তখন সমগ্র সমবেত জনতার মধ্য থেকে একমাত্র হযরত লূত (আ) তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। হতে পারে সে সময় আরো বহুলোক মনে মনে হযরত ইবরাহীমের সত্যতা স্বীকার করে থাকবে। কিন্তু সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইবরাহীমের দীনের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ও আক্রোশ প্রবণতার প্রকাশ সে সময় সবার চোখের সামনে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি এ ধরনের ভয়ংকর সত্য মেনে নেবার এবং তার সাথে সহযোগিতা করার সাহস করতে পারেনি। এ সৌভাগ্য মাত্র এক ব্যক্তিরই হয়েছিল এবং তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীমেরই ভাতিজা হযরত লূত (আ)। শেষে তিনি হিজরাতকালেও নিজের চাচা ও চাচীর (হযরত সারাহ) সহযোগী হয়েছিলেন।

এখানে একটি সন্দেহ দেখা দেয় এবং এ সন্দেহটি নিরসন করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে যে, তাহলে এ ঘটনার পূর্বে কি হযরত লূত কাফের ও মুশরিক ছিলেন এবং আগুন থেকে হযরত ইবরাহীমের নিরাপদে বের হয়ে আসার অলৌকিক কাণ্ড দেখার পর তিনি ঈমানের নিয়ামত লাভ করেন? যদি একথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াতের আসনে কি এমন কোন ব্যক্তি সমাসীন হতে পারেন যিনি পূর্বে মুশরিক ছিলেন? এর জবাব হচ্ছে, কুরআন এখানে فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এ থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে, ইতিপূর্বে হযরত লূত বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহকে না মেনে থাকবেন বা তাঁর সাথে অন্য মাবুদদেরকেও শরীক করে থাকবেন বরং এ থেকে কেবলমাত্র এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনার পর তিনি হযরত ইবরাহীমের রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। ঈমানের

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ز مَا سَبَقَكُم
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِينَ ۝٢٨ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۝ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ط فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ
الصّٰدِقِينَ ۝٢٩ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝٣٠

আর আমি লূতকে পাঠাই[৫০] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি। তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছো,[৫১] রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে খারাপ কাজ করছো?"[৫২] তারপর তার সম্প্রদায়ের কাছে এ ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "নিয়ে এসো আল্লাহর আযাব যদি তুমি সত্যবাদী হও।" লূত বললো, "হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।"

সাথে যখন লাম (لام) শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় কোন ব্যক্তির কথা মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। হতে পারে হযরত লূত তখন ছিলেন একজন উঠতি বয়সের তরুণ এবং সচেতনভাবে নিজের চাচার শিক্ষার সাথে তিনি এ প্রথমবার পরিচিত হবার এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে থাকবেন।

৪৫. অর্থাৎ আমার রবের জন্য হিজরাত করছি। এখন আমার রব আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যাবো।

৪৬. অর্থাৎ তিনি আমাকে সহায়তা দান ও হেফাজত করার ক্ষমতা রাখেন এবং আমার পক্ষে তিনি যে ফায়সালা করবেন তা বিজ্ঞজনোচিতই হবে।

৪৭. হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং হযরত ইয়াকূব ছিলেন পৌত্র। এখানে হযরত ইবরাহীমের (আ) অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম সন্তানদের মাদ্‌য়ানী শাখায় কেবলমাত্র হযরত শো'আইব আলাইহিস সালামই নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাঈলী শাখায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

৪৮. হযরত ইবরাহীমের (আ) পরে যেসব নবীর আবির্ভাব হয় সবাই এর মধ্যে এসে গেছেন।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছুলো,[৫৩] তারা তাকে বললো, "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো,[৫৪] এর অধিবাসীরা বড়ই জালেম হয়ে গেছে।" ইবরাহীম বললো "সেখানে তো লূত আছে।"[৫৫] তারা বললো, "আমরা ভালোভাবেই জানি সেখানে কে কে আছে, আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো তার স্ত্রীকে ছাড়া;" সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত।[৫৬]

৪৯. এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, ব্যবিলনের যেসব শাসক, পণ্ডিত ও পুরোহিত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল এবং সেখানকার যে সকল মুশরিক অধিবাসী চোখ বন্ধ করে ঐ জালেমদের আনুগত্য করেছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তাঁর নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী রব্বুল আলামীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। এ চল্লিশ'শ বছরে দুনিয়া একমাত্র সেই পাক-পবিত্র ব্যক্তি এবং তাঁর সন্তানদের থেকেই যা কিছু হিদায়াতের আলোক বর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি।

৫০. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ, ১০; হূদ, ৭; আল হিজর, ৪-৫; আল আম্বিয়া, ৫; আশ শু'আরা, ৯; আন নাম্‌ল, ৪; আস্ সাফ্‌ফাত, ৪ ও আল কামার, ২ রুকূ'।

৫১. অর্থাৎ তাদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছো, যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّكُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ

"তোমরা যৌন কামনা পূর্ণ করার জন্য মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে গিয়ে থাকো।"

৫২. অর্থাৎ এ অশ্লীল কাজটি লুকিয়ে চাপিয়েও করো না বরং প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিসে পরস্পরের সামনে করে থাকো। একথাটিই সূরা আন নাম্‌লে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَتَاتُونَ الفَاحِشَةَ وَاَنتُم تُبصِرُونَ

"তোমরা কি এমনই বিগড়ে গিয়েছো যে, প্রকাশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই অশ্লীল কাজ করে থাকো?"

৫৩. সূরা হূদ ও সূরা হিজ্‌রে এর যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য যেসব ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে হযরত ইবরাহীমের কাছে হাজির হন এবং তাঁকে হযরত ইসহাকের এবং তাঁর পর হযরত ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দেন তারপর বলেন, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

৫৪. "এ জনপদ" বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরের (Dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইংগিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো।" (দেখুন সূরা আশ্ শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৫৫. সূরা হূদে এ কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশ্তাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে ভয় পেয়ে যান। কারণ এ আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন কোন ভয়াবহ অভিযানের পূর্বাভাস দেয়। তারপর যখন তাঁরা তাঁকে সুসংবাদ দান করেন এবং তাঁর ভীতি দূর হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, লূতের জাতি হচ্ছে এ অভিযানের লক্ষ। তাই সে জাতির জন্য তিনি করুণার আবেদন জানাতে থাকেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتهُ البُشرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ اِنَّ اِبرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

কিন্তু তাঁর এ আবেদন গৃহীত হয়নি এবং বলা হয় এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। তোমার রবের ফায়সালা হয়ে গেছে এ আযাবকে এখন আর ফেরানো যাবে না ঃ

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۗ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۳۵﴾

তারপর যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের কাছে পৌঁছুলো তাদের আগমনে সে অত্যন্ত বিব্রত ও সংকুচিত হৃদয় হয়ে পড়লো।[৫৭] তারা বললো, "ভয় করো না এবং দুঃখও করো না।[৫৮] আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত। আমরা এ জনপদের লোকদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি তারা যে পাপাচার করে আসছে তার কারণে।" আর আমি সে জনপদের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি[৫৯] তাদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।[৬০]

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ -

এ জবাবের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বুঝতে পারেন লূত জাতির জন্য আর কোন অবকাশের আশা নেই তখনই তাঁর মনে জাগে হযরত লূতের চিন্তা। তিনি যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন "সেখানে তো লূত রয়েছে।" অর্থাৎ এ আযাব যদি লূতের উপস্থিতিতে নাযিল হয় তাহলে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ তা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকবেন।

৫৬. এ মহিলা সম্পর্কে সূরা তাহরীমে (১০ আয়াত) বলা হয়েছে ঃ হযরত লূতের এই স্ত্রী তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

সম্ভবত হিজরাত করার পর হযরত লূত জর্দান এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবেন এবং তখনই তিনি এ জাতির মধ্যে বিয়ে করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে জীবনের একটি বিরাট অংশ পার করে দেবার পরও এ মহিলা ঈমান আনেনি এবং তার সকল সহানুভূতি ও আকর্ষণ নিজের জাতির ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কোন গুরুত্ব নেই, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয়

তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়।

৫৭. এ বিব্রতবোধ ও সংকুচিত হৃদয় হবার কারণ এই ছিল যে, ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণদের রূপ ধরে এসেছিলেন। হযরত লূত নিজের জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাদের আসা মাত্রই তিনি পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি যদি এ মেহমানদেরকে অবস্থান করতে দেন তাহলে ঐ ব্যভিচারী জাতির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে আর যদি অবস্থান করতে না দেন তাহলে সেটা হবে বড়ই অভদ্র আচরণ। তাছাড়া এ আশংকাও আছে, তিনি যদি এ মুসাফিরদেরকে আশ্রয় না দেন তাহলে অন্য কোথাও তাদের রাত কাটাতে হবে এবং এর অর্থ হবে যেন তিনি নিজেই তাদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন। এর পরের ঘটনা আর এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সূরা হূদ ও কামারে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ কিশোরদের আগমন সংবাদ শুনে শহরের বহু লোক হযরত লূতের গৃহে এসে ভীড় জমালো। তারা ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত হবার উদ্দেশে মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে। এরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ও করো না এবং এদের হাত থেকে কিভাবে আমাদের বাঁচাবে সে চিন্তাও করো না। এ সময়ই ফেরেশতারা হযরত লূতের কাছে এ রহস্য ফাঁস করেন যে, তারা মানুষ নন বরং ফেরেশ্‌তা এবং এ জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সূরা হূদে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে, লোকেরা যখন একনাগাড়ে লূতের গৃহে প্রবেশ করে চলছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন. এখন আর কোনক্রমেই নিজের মেহমানদেরকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না তখন তিনি পেরেশান হয়ে চিৎকার করে বলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

"হায়! আমার যদি শক্তি থাকতো তোমাদের সোজা করে দেবার অথবা কোন শক্তিশালীর সহায়তা আমি লাভ করতে পারতাম।"

এ সময় ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ

يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ

"হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। এরা কখ্‌খনো তোমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

৫৯. এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মরুসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই জালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্য রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞٣٦ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ۞٣٧ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ۞٣٨

আর মাদ্‌য়ানের দিকে আমি পাঠালাম তাদের ভাই শু'আইবকে।[৬১] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, শেষ দিনের প্রত্যাশী হও[৬২] এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িও না।" কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৬৩] শেষে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে[৬৪] মরে পড়ে থাকলো।

আর আদ ও সামূদকে আমি ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকতো সেসব জায়গা তোমরা দেখেছো[৬৫] তাদের কার্যাবলীকে শয়তান তাদের জন্য সুদৃশ্য বানিয়ে দিল এবং তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করলো অথচ তারা ছিল বুদ্ধি সচেতন।[৬৬]

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ (الحجر) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ (الصافات)

বর্তমান যুগে একথাটি প্রায় নিশ্চয়তা সহকারেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে যে, মরুসাগরের দক্ষিণ অংশটি একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পজনিত ভূমিধ্বসের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এ ধ্বসে যাওয়া অংশেই অবস্থিত ছিল লূত জাতির কেন্দ্রীয় নগরী সাদোম (Sodom)। এ অংশে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে অত্যাধুনিক ডুবুরী সরঞ্জামের সহায়তায় কিছু লোকের নীচে নেমে ঐসব ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনো এ প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল জানা যায়নি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআর, সূরা শু'আরা, ১১৪ টীকা)

৬০. লূতের জাতির কর্মের শরীয়াতবিহিত শাস্তির জন্য দেখুন, 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা আ'রাফ, ৬৮ টীকা।

৬১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আ'রাফ, ১১; হূদ, ৮ এবং আশ্ শু'আরা, ১০ রুকূ'।

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ۝٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝٤٠

আর কারূন, ফেরাউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে অথচ তারা অগ্রগমনকারী ছিল না।[৬৭] শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে আমি তার গোনাহের জন্য পাকড়াও করি। তারপর তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর আমি পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রবাহিত করি[৬৮] এবং কাউকে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আঘাত হানে[৬৯] আবার কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করি[৭০] এবং কাউকে ডুবিয়ে দিই।[৭১] আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছিল।[৭২]

৬২. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ–কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো।

৬৩. অর্থাৎ একথা স্বীকার করলো না যে, আল্লাহর রসূল হযরত শু'আইব (আ), যে শিক্ষা তিনি দিচ্ছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একে না মানলে তাদেরকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

৬৪. ঘর বলতে এখানে এই জাতি যে এলাকায় বসবাস করতো সেই সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যখন পুরোপুরি একটি জাতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে তখন তার দেশই তার ঘর হতে পারে।

৬৫. আরবের যেসব এলাকায় এ দু'টি জাতির বসতি ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদ্রা মাউত নামে পরিচিত প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। আরবের লোকেরা একথা জানতো। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত এবং মদীনা ও

খায়বর থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে।

৬৬. অর্থাৎ অজ্ঞ ও মূর্খ ছিল না। তারা ছিল তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ সুসভ্য ও প্রগতিশীল লোক। নিজেদের দুনিয়ার কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যাপারে তারা পূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতো। তাই একথা বলা যাবে না যে, শয়তান তাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়ে এবং বুদ্ধি বিনষ্ট করে দিয়ে নিজের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল।

৬৭. অর্থাৎ পালিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহর কৌশল ব্যর্থ করে দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

৬৮. অর্থাৎ আদ জাতি। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। (সূরা আল হাক্কাহ, ৭ আয়াত)

৬৯. অর্থাৎ সামূদ।

৭০. অর্থাৎ কারূন।

৭১. ফেরাউন ও হামান।

৭২. এ পর্যন্ত যেসব কাহিনী শুনানো হলো সেগুলোর বক্তব্যের লক্ষ ছিল দু'টি। একদিকে এগুলো মু'মিনদেরকে শোনানো হয়েছে, যাতে তারা হিম্মতহারা, ভগ্ন হৃদয় ও হতাশ না হয়ে পড়ে এবং বিপদ ও সংকটের কঠিন আবর্তেও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখে এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই এসে যাবে, তিনি জালেমদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং সত্যের ঝাণ্ডা উঁচু করে দেবেন। অন্যদিকে এগুলো এমন জালেমদেরকেও শুনানো হয়েছে যারা তাদের ধারণা মতে ইসলামী আন্দোলনকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল।-তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সংযম ও সহিষ্ণুতার ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে একটি অরাজক রাজত্ব মনে করেছো। তোমাদের যদি এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ, সীমালংঘন, জুলুম, নিপীড়ন ও অসৎকাজের জন্য পাকড়াও না করা হয়ে থাকে এবং সংশোধিত হবার জন্য অনুগ্রহ করে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিজে নিজেই একথা মনে করে বসো না যে, এখানে আদতে কোন ইনসাফকারী শক্তিই নেই এবং এ ভূখণ্ডে লাগামহীনভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত যাচ্ছে তাই করে যেতে পারবে। এ বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে এমন-পরিণতির সম্মুখীন করবেই ইতিপূর্বে নূহের জাতি, লূতের জাতি ও শু'আইবের জাতি যার সম্মুখীন হয়েছিল, আদ ও সামূদ জাতিকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কারূন ও ফেরাউন যে পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۖۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা। সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে এবং সব ঘরের চেয়ে বেশী দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায় যদি এরা জানতো।[৭৩]

৭৩. ওপরে যতগুলো জাতির কথা বলা হয়েছে তারা সবাই শির্কে লিপ্ত ছিল। নিজেদের উপাস্যের ব্যাপারে তাদের আকীদা ছিল ঃ এরা আমাদের সহায়ক সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক (Guardians) এরা আমাদের ভাগ্য ভাংগা গড়ার ক্ষমতা রাখে। এদের পূজা করে এবং এদেরকে মানত ও নজরানা পেশ করে যখন আমরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবো তখন এরা আমাদের কাজ করে দেবে এবং সব ধরনের বিপদ–আপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে। কিন্তু যেমন ওপরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দেখানো হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তাদের ধ্বংসের ফায়সালা করা হয় তখন তাদের উপরোল্লিখিত সমস্ত আকীদা–বিশ্বাস ও ধারণা–কল্পনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। সে সময় তারা যেসব দেব–দেবী, অবতার, অলী, আত্মা, জিন বা ফেরেশ্‌তাদের পূজা করতো তাদের একজনও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং নিজেদের মিথ্যা আশার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা মাটির সাথে মিশে গেছে। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর এখন মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, বিশ্ব–জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাকে বাদ দিয়ে একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে যে আশার আকাশ কুসুম তোমরা রচনা করেছো তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশী কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশ্‌ত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা যে কল্পনা বিলাসের এমন এক চক্করের মধ্যে পড়ে আছো, এটা নিছক তোমাদের মূর্খতার কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের যদি সামান্যতম জ্ঞানও তোমাদের থাকতো, তাহলে তোমরা এসব ভিত্তিহীন সহায় ও নির্ভরের ওপর কখনো জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না। সত্য কেবলমাত্র এতটুকুই, এ বিশ্ব–জাহানে ক্ষমতার মালিক একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কেউ নেই এবং একমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[৭৪] মানুষকে উপদেশ দেবার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন। আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্য-ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন,[৭৫] প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।[৭৬]

"যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" (আল বাকারাহ, ২৫৬ আয়াত)

৭৪. অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মাবুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সহায্যের জন্য আহবান করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রম ও জ্ঞানের অধিকারী।

৭৫. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে ইমারতই দাঁড় করানো হবে তা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের সাথে সংঘাত বাধিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ্ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহ্ই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

৫ রুকূ'

(হে নবী।) তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো এবং নামায কায়েম করো,[৭৭] নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৭৮] আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড় জিনিস।[৭৯] আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো।

বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত–অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতমও পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

৭৬. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির মধ্যে তাওহীদের সত্যতা এবং শিরক ও নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা হবার ওপর একটি পরিষ্কার সাক্ষ–প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ প্রমাণের সন্ধান একমাত্র তারাই পায় যারা নবীগণের শিক্ষা মেনে নেয়। নবীগণের শিক্ষা অস্বীকারকারীরা সবকিছু দেখার পরও কিছুই দেখে না।

৭৭. আপাত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের ওপর সে সময় যেসব জুলুম–নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল সে সবের মোকাবিলা করার জন্য পিছনের চার রুকূ'তে অনবরত সবর, দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার উপদেশ দেবার পর এখন তাদেরকে বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করার কথা বলা হচ্ছে। কারণ এ দু'টি জিনিসই মু'মিনকে, এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝন্‌ঝার মোকাবিলায় শুধু মাত্র টিকে থাকতে নয় বরং তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে এবং তার নামায কেবলমাত্র শারীরিক কসরতের

মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং চরিত্র ও কর্মের সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়। সামনের দিকের বক্তব্যে কুরআন মজীদ নিজেই নামাযের কাংখিত গুণ বর্ণনা করছে। আর কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে এতটুকু জানা দরকার-যে, মানুষের কন্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তেলাওয়াত আঘাত হানতে পারে না তা তাকে কুফরীর বন্যা প্রবাহের মোকাবিলায় শক্তি তো দূরের কথা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও দান করতে পারে না। যেমন হাদীসে একটি দল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يقرأون القران ولا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية

"তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালীর নীচে নামবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শর ধনুক থেকে বরে হয়ে যায়।" (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন–মানস, চিন্তা–চেতনা ও চরিত্র–কর্মনীতিতেও কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মু'মিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না। এ সম্পর্কে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম পরিষ্কার বলেন ঃ ما امن بالقران من استحل محارمه "কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।" (তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছে হযরত সুহাইব রূমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে) এ ধরনের তেলাওয়াত মানুষের আত্মিক সংশোধন এবং তার আত্মায় শক্তি সঞ্চার করার পরিবর্তে তাকে আল্লাহর মোকাবিলায় আরো বেশী বিদ্রোহী এবং নিজের বিবেকের মোকাবিলায় আরো বেশী নির্লজ্জ করে তোলে। এ অবস্থায় তার মধ্যে চরিত্র বলে কোন জিনিসেরই আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নেয়, তা পাঠ করে তার মধ্যে আল্লাহ তাকে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানতেও থাকে এবং তারপর তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে যেতে থাকে, তার ব্যাপারটা তো দাঁড়ায় এমন একজন অপরাধীর মতো যে আইন না জানার কারণে নয় বরং আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর অপরাধমূলক কাজ করে। এ অবস্থাটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঃ القران حجة لك او عليك "কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।" (মুসলিম) অর্থাৎ যদি কুরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা হয় তাহলে তা তোমার জন্য সাক্ষ ও প্রমাণ হবে। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যেখানেই তোমাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে সেখানেই তুমি নিজের সাফাই হিসেবে কুরআনকে পেশ করতে পারবে। অর্থাৎ তুমি বলতে পারবে, আমি যা কিছু করেছি এ কিতাব অনুযায়ী করেছি। যদি তোমার কাজ যথার্থই কুরআন অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ইসলামের কোন বিচারক তোমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানেও তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যদি এ কিতাব তোমার কাছে পৌঁছে গিয়ে থাকে এবং তা পড়ে তুমি জেনে নিয়ে থাকো তোমার রব তোমাকে কি বলতে চান, তোমাকে কোন্ কাজের হুকুম দেন, কোন্ কাজ

করতে নিষেধ করেন এবং আবার তুমি তার বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করো, তাহলে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহর অদালতে এ কিতাব তোমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাকে আরো বেশী জোরদার করে দেবে। এরপর না জানার ওজর পেশ করে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অথবা হালকা শাস্তি লাভ করা তোমার জন্য সম্ভব হবে না।

৭৮. নামাযের বহু গুণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকে সুস্পষ্ট করে এখানে পেশ করা হয়েছে। মক্কার বিরুদ্ধ পরিবেশে মুসলমানরা যে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মোকাবিলা করার জন্য তাদের বস্তুগত শক্তির চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল নৈতিক শক্তির। এ নৈতিক শক্তির উদ্ভব ও তার বিকাশ সাধনের জন্য প্রথমে দু'টি ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়টি নামায কায়েম করা। এরপর এখন এখানে বলা হচ্ছে, নামায কায়েম করা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে তোমরা এমনসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারো ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেগুলোতে তোমরা নিজেরাই লিপ্ত ছিলে এবং যেগুলোতে বর্তমানে লিপ্ত আছে তোমাদের চারপাশের আরবীয় ও অনারবীয় জাহেলী সমাজ।

এ পর্যায়ে নামাযের এই বিশেষ উপকারিতার কথা বলা হয়েছে কেন, একটু চিন্তা করলে একথা অতি সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, নৈতিক দুষ্কৃতিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী লোকেরা এর মাধ্যমে কেবলমাত্র দুনিয়ায় ও আখেরাতেই লাভবান হয় না বরং এর ফলে তারা অনিবার্যভাবে এমন সব লোকদের ওপর ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যারা নানান নৈতিক দুষ্কৃতির শিকার হয়ে গেছে এবং এসব দুষ্কৃতির লালনকারী জাহেলিয়াতের পূতিগন্ধময় অপবিত্র ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অশ্লীল ও অসৎকাজ বলতে যেসব দুষ্কৃতি বুঝায় মানুষের প্রকৃতি সেগুলোকে খারাপ বলে জানে এবং সবসময় সকল জাতি ও সকল সমাজের লোকেরা, কার্যত তারা যতই বিপথগামী হোক না কেন, নীতিগতভাবে সেগুলোকে খারাপই মনে করে এসেছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবের সমাজ মানসও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সে সমাজের লোকেরাও নৈতিকতার পরিচিত দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা অসৎকাজের মোকাবিলায় সৎকাজের মূল্য জানতো। কদাচিত হয়তো এমন কোন লোকও তাদের মধ্যে থেকে থাকবে যে অসৎকাজকে ভালো কাজ মনে করে থাকবে এবং ভালো কাজকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকবে। এ অবস্থায় এ বিকৃত সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয় যার সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই নৈতিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং নিজেদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নিজেদের সমকালীন লোকদের থেকে সুস্পষ্ট উন্নতি লাভ করে, তাহলে অবশ্যই সে তার প্রভাব বিস্তার না করে থাকতে পারে না। এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না যে, আরবের সাধারণ লোকেরা অসৎকাজ নির্মূলকারী এবং সৎ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানুষ গঠনকারী এ আন্দোলনের নৈতিক প্রভাব মোটেই অনুভব করবে না এবং এর মোকাবিলায় নিছক জাহেলিয়াত প্রীতির অন্তসারশূন্য শ্লোগানের ভিত্তিতে এমনসব লোকদের সাথে সহযোগিতা করে যেতে থাকবে যারা নিজেরাই নৈতিক

দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং জাহেলিয়াতের যে ব্যবস্থা শত শত বছর থেকে সে দুষ্কৃতিগুলো লালন করে চলছিল তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণেই কুরআন এ অবস্থায় মুসলমানদের বস্তুগত উপকরণাদি ও শক্তিমত্তা সংগ্রহ করার পরামর্শ দেবার পরিবর্তে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে মুষ্টিমেয় মানুষের এ দলটি এমন চারিত্রিক শক্তির অধিকারী হবে যার ফলে তারা মানুষের মন জয় করে ফেলবে এবং তীর ও তরবারির সাহায্য ছাড়াই শত্রুকে পরাজিত করবে।

এ আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার অনিবার্য গুণ। অর্থাৎ সে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর দ্বিতীয়টি তার কাংখিত গুণ। অর্থাৎ নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখুক। বিরত রাখার ব্যাপারে বলা যায়, নামায অবশ্যই এ কাজ করে। যে ব্যক্তিই নামাযের ধরনের ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করবে সে–ই স্বীকার করবে, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যত ধরনের ব্রেক লাগানো সম্ভব তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ব্রেক নামাযই হতে পারে। এরচেয়ে বড় প্রভাবশালী নিরোধক আর কী হতে পারে যে, মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আহবান করা হবে এবং তার মনে একথা জাগিয়ে দেয়া হবে যে, তুমি এ দুনিয়ায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও বরং এক আল্লাহর বান্দা এবং তোমার আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি তোমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ এমনকি তোমার মনের ইচ্ছা ও সংকল্পও জানেন এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের যাবতীয় কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তারপর কেবলমাত্র একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত থাকলে চলবে না বরং কার্যত প্রত্যেক নামাযের সময় যাতে লুকিয়ে লুকিয়েও সে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য না করে তার অনুশীলনও করতে হবে। নামাযের জন্য ওঠার পর থেকে শুরু করে নামায খতম করা পর্যন্ত মানুষকে অনবরত এমনসব কাজ করতে হয় যেগুলো করার সময় সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে একথা সে এবং তার আল্লাহ ছাড়া তৃতীয় কোন সত্তা জানতে পারে না। যেমন, যদি কারো অযু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে এবং সে নামায পড়তে দাঁড়ায়, তাহলে তার যে অযু নেই একথা সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে–ই বা জানতে পারবে। মানুষ যদি নামাযের নিয়তই না করে এবং বাহ্যত রুকূ', সিজদা ও উঠা–বসা করে নামাজের সূরা–কেরাত, দোয়া–দরূদ ইত্যাদি পড়ার পরিবর্তে নিরবে গজল পড়তে থাকে তাহলে সে যে আসলে নামায পড়েনি সে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে? এ সত্ত্বেও যখন মানুষ শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন থেকে শুরু করে নামাযের আরকান ও সূরা–কেরাত–দোয়া–দরূদ পর্যন্ত সবকিছু সম্পন্ন করে আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ে তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ নামাযের মাধ্যমে প্রতিদিন কয়েকবার তার বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করা হচ্ছে, তার মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাকে দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত করা হচ্ছে এবং যে আইনের প্রতি সে ঈমান এনেছে তা মেনে চলার জন্য বাইরে কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং বিশ্ববাসী তার কাজের অবস্থা জানুক বা না জানুক নিজের আনুগত্য প্রবণতার প্রভাবাধীনে গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল অবস্থায় সে সেই আইন মেনে চলবে—কার্যত তাকে এরি অনুশীলন করানো হচ্ছে।

এ দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না যে, নামায কেবলমাত্র মানুষকে অশ্লীল ও অসৎকাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং আসলে দুনিয়ায় দ্বিতীয় এমন কোন অনুশীলন পদ্ধতি নেই যা মানুষকে দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এত বেশী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ নিয়মিত নামায পড়ার পর কার্যতও দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকে কি না। জবাবে বলা যায়, এটা নির্ভর করে যে ব্যক্তি আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির অনুশীলন করছে তার ওপর। সে যদি এ থেকে উপকৃত হবার সংকল্প করে এবং এ জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে নামাযের সংশোধনমূলক প্রভাব তার ওপর পড়বে। অন্যথায় দুনিয়ার কোন সংশোধন ব্যবস্থা এমন ব্যক্তির ওপর কার্যকর হতে পারে না যে তার প্রভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুতই নয় অথবা জেনে বুঝে তার প্রভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। এর দৃষ্টান্ত যেমন দেহের পরিপুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি হচ্ছে খাদ্যের অনিবার্য বিশেষত্ব। কিন্তু এ ফল তখনই লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে যখন মানুষ তাকে শরীরের অংশে পরিণত হবার সুযোগ দেবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যেক বারে খাবার পরে বমি করে সমস্ত খাবার বের করে দিতে থাকে তাহলে এ ধরনের আহার তার জন্য মোটেই উপকারী হতে পারে না। এ ধরনের কোন ব্যক্তিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়ে যেমন একথা বলা চলে না যে, খাদ্য দ্বারা দেহের পরিপুষ্টি হয় না। কারণ, দেখা যাচ্ছে অমুক ব্যক্তি আহার করার পরও শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এমন একজন নামাযী যে অসৎকাজ করে যেতেই থাকে, তার দৃষ্টান্ত পেশ করেও একথা বলা যেতে পারে না যে, নামায অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে না। কারণ, ওমুক ব্যক্তি নামায পড়ার পরও খারাপ কাজ করে। এ ধরনের নামাযী সম্পর্কে তো একথা বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত হবে যে, সে আসলে নামায পড়ে না যেমন যে ব্যক্তি আহার করে বমি করে তার সম্পর্কে একথা বলা বেশী যুক্তিযুক্ত যে, সে আসলে আহার করে না।

ঠিক একথাই বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অনেক নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له "যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তার নামাযই হয়নি।" (ইবনে আবী হাতেম) ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا

"যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তাকে তার নামায আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে।" (ইবনে আবী হাতেম ও তাবারানী)

হাসান বাসরী (র) একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল রেওয়ায়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর ও বাইহাকী) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে নবী করীমের (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

আর[৮০] উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না[৮১] তবে তাদের মধ্যে যারা জালেম[৮২] তাদেরকে বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছে তার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিও, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী।[৮৩]

لا صلوة لمن لم يطع الصلوة وطاعة الصلوة ان تنهى عن الفحشاء والمنكر

"যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করেনি তার নামাযই হয়নি আর নামাযের আনুগত্য হচ্ছে, মানুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।" (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)

একই বক্তব্য সম্বলিত একাধিক উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, কাতাদাহ, আ'মাশ ও আরো অনেকের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম জাফর সাদেক বলেন, যে ব্যক্তি তার নামায কবুল হয়েছে কিনা একথা জানতে চায় তার দেখা উচিত তার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে কি পরিমাণ বিরত রেখেছে। যদি নামাযের বাধা দেবার পর সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে থাকে, তাহলে তার নামায কবুল হয়ে গেছে। (রূহুল মা'আনী)

৭৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহর যিকির (অর্থাৎ নামায) এর চেয়ে বড়। এর প্রভাব কেবল নেতিবাচকই নয়। শুধুমাত্র অসৎকাজ থেকে বিরত রেখেই সে ক্ষান্ত থাকে না। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার জন্য মানুষকে উদ্যোগী করে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ নিজেই অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের কোন কাজ এর চেয়ে বেশী ভালো নয়। এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহর তোমাকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন : فَاذْكُرُونِى اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" (আল বাকারাহ ১৫২ আয়াত) কাজেই বান্দা যখন নামাযে আল্লাহকে স্মরণ করবে তখন অবশ্যই আল্লাহও তাকে স্মরণ করবেন। আর বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার তুলনায় আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা অনেক বেশী উচ্চমানের। এ তিনটি অর্থ ছাড়া আরো একটি

সূক্ষ্ম অর্থও এখানে হয়। হযরত আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিতা স্ত্রী এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সীমানা এর চাইতেও বহুদূর বিস্তৃত। যখন মানুষ রোযা রাখে, যাকাত দেয় বা অন্য কোন সৎকাজ করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহকে স্মরণই করে, তবেই তো তার দ্বারা ঐ সৎকাজটি সম্পাদিত হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি কোন অসৎকাজ করার সুযোগ পাওয়ার পর তা থেকে দূরে থাকে তখন এটাও হয় আল্লাহর স্মরণেরই ফল। এ জন্য আল্লাহর স্মরণ একজন মু'মিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়।

৮০. উল্লেখ্য, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সূরায় হিজরাত করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সে সময় হাব্‌শাই ছিল মুসলমানদের পক্ষে হিজরাত করে যাবার জন্য একমাত্র নিরাপদ জায়গা। আর হাবশায় সে সময় ছিল খৃষ্টানদের প্রাধান্য। তাই আহলে কিতাবের মুখোমুখি হলে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন্ ধরনের ও কিভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে আয়াতগুলোতে সেসব উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৮১. অর্থাৎ বিতর্ক ও আলাপ–আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি–প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্যকথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। একজন পাহ্‌লোয়ানের মতো তার লড়াই করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্যই হয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বরং একজন ডাক্তারের মতো তাকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করার সময় একথাকে গুরুত্ব দেন যে, তাঁর নিজের কোন ভুলের দরুন রোগীর রোগ যেন আরো বেশী বেড়ে না যায় এবং সর্বাধিক কম কষ্ট সহ্য করে যাতে তাঁর রোগীর রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব হয় এ জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আহ্‌লি কিতাবের সাথে বিতর্ক–আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে আহ্‌লি কিতাবদের জন্য নয় বরং দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

"আহবান করো নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক–আলোচনা করো।" (আন নাহল, ১২৫)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

"সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। তুমি দেখবে এমন এক ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেমন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।" (হা–মীম আস্‌ সাজদাহ, ৩৪)

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۭ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

"তুমি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করো। আমি জানি (তোমার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরি করে।" (আল মু'মিনূন, ৯৬)

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান তোমাকে উস্‌কানী দেয় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও।" (আল আ'রাফ, ১৯৯-২০০)

৮২. অর্থাৎ যারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের জুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মোকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে চলবে না। যেন মানুষ সত্যের আহবায়কের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দেয় কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয় না। তাদেরকে প্রত্যেক জালেমের জুলুমের সহজ শিকারে পরিণত হবার শিক্ষা দেয় না।

৮৩. এ বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহ নিজেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। সত্য প্রচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাদের এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এখানে শেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিতর্ক করতে হবে তার ভ্রষ্টতাকে আলোচনার সূচনা বিন্দুতে পরিণত করো না। বরং সত্য ও ন্যায়-নীতির যে অংশংগুলো তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বিরাজ করছে সেগুলো থেকে আলোচনা শুরু করো। অর্থাৎ বিরোধীয় বিন্দু থেকে আলোচনা শুরু না করে ঐক্যের বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। তারপর সেই সর্বসম্মত বিষয়াবলী থেকে যুক্তি পেশ করে শ্রোতাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে, তোমার ও তার মধ্যে যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে তোমার অভিমত সর্বসম্মত ভিত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার অভিমত হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী।

এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, আহ্‌লি কিতাব আরবের মুশরিকদের মতো অহী, রিসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারী ছিল না। বরং তারা মুসলমানদের মতো এ সত্যগুলো স্বীকার করতো। এ মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করার পর যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধের বড় কোন ভিত্তি হতে পারতো তাহলে তা হতো এই যে, তাদের কাছে যেসব আসমানী কিতাব এসেছে মুসলমানরা সেগুলো মানছে না এবং মুসলমানদের নিজেদের কাছে যে আসমানী কিতাব এসেছে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে আর তা গ্রহণ না করলে তাদেরকে কাফের গণ্য করছে। বিরোধের জন্য এটি খুবই শক্তিশালী ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থান ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আহলি কিতাবের কাছে যেসব কিতাব ছিল সেসবকেই তারা সত্য বলে মানতো এবং এ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

(হে নবী) আমি এভাবেই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি,[৮৪] *এ জন্য যাদেরকে আমি প্রথমে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে*[৮৫] *এবং এদের অনেকেও এতে বিশ্বাস করছে*[৮৬] *আর আমার আয়াত একমাত্র কাফেররাই অস্বীকার করে।*[৮৭]

সংগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছিল তার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। এরপর কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আহলি কিতাব এক আল্লাহরই নাযিল করা একটি কিতাব মানে এবং অন্যটি মানে না একথা বলার দায়িত্ব ছিল তাদের নিজেদেরই। এ জন্য আল্লাহ এখানে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখনই আহলি কিতাবদের মুখোমুখি হবে সবার আগে তাদের কাছে ইতিবাচকভাবে নিজেদের এ অবস্থানটি তুলে ধরো। তাদেরকে বলো, তোমরা যে আল্লাহকে মানো আমরাও তাঁকেই মানি এবং আমরা তাঁর হুকুম পালন করি। তাঁর পক্ষ থেকে যে বিধান, নির্দেশ ও শিক্ষাবলীই এসেছে, তা তোমাদের ওখানে বা আমাদের এখানে যেখানেই আসুক না কেন, সেসবের সামনে আমরা মাথা নত করে দেই। আমরা তো হুকুমের দাস। দেশ, জাতি ও বংশের দাস নই। আল্লাহর হুকুম এক জায়গায় এলে আমরা মেনে নেবো এবং এই একই আল্লাহর হুকুম অন্য জায়গায় এলে আমরা তা মানবো না, এটা আমাদের রীতি নয়। একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বার বার বলা হয়েছে। বিশেষ করে আহলি কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তো জোর দিয়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন, সূরা আল বাকারার ৪, ১৩৬, ১৭৭; আলে ইমরানের ৮৪; আন্ নিসার ১৩৬, ১৫০–১৫২, ১৬২–১৬৪ এবং আশ্ শূরার ১৩ আয়াত।

৮৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। দুই, আমি এই শিক্ষা সহকারেই একে নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলো সব স্বীকার করে নিয়েই একে মানতে হবে।

৮৫. পূর্বাপর বিষয়বস্তু নিজেই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে সমস্ত আহলি কিতাবের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব আহলি কিতাবের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা কেবলমাত্র এ কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জীবের মতো নিছক কিতাবের বোঝা বহন করে বেড়াতেন না বরং প্রকৃত অর্থেই ছিলেন কিতাবধারী। তাদের সামনে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে এ শেষ কিতাবটি এলো তখন তারা কোন

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

(হে নবী) ইতিপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।[৮৮] আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন এমন লোকদের মনের মধ্যে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[৮৯] এবং জালেমরা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতির আশ্রয় নিলেন না এবং তাকেও ঠিক তেমনি আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করে নিলেন যেমন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে স্বীকার করতেন।

৮৬. "এদের" শব্দের মাধ্যমে আরববাসীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সত্যপ্রিয় লোকেরা, তারা আহলি কিতাব বা অ-আহলি কিতাব যারাই হোক না কেন, সর্বত্রই এর প্রতি ঈমান আনছে।

৮৭. এখানে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে যারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতি ত্যাগ করে সত্য কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অথবা যারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও অবাধ স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে পিছটান দেয় এবং এরি ভিত্তিতে সত্য অস্বীকার করে।

৮৮. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে একটি যুক্তি। ইতিপূর্বে সূরা ইউনুস ও সূরা কাসাসে এ যুক্তি আলোচিত হয়েছে (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২১ টীকা এবং সূরা কাসাস, ৬৪ ও ১০৯ টীকা। এ বিষয়বস্তুর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাহল, ১০৭; বনী ইসরাঈল, ১০৫; আল মু'মিনুন, ৬৬; আল ফুরকান, ১২ এবং আশ্ শূরা, ৮৪ টীকাগুলো অধ্যয়নও সহায়ক হবে)।

এ আয়াতে যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-বান্ধবগণ, যাদের মধ্যে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন, সবাই ভালোভাবে জানতো তিনি সারা জীবন কখনো কোন বই পড়েননি এবং কলম হাতে ধরেননি। এ সত্য ঘটনাটি পেশ করে মহান আল্লাহ বলছেন, এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাবলী, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দীনের আকীদা-বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ এ নিরক্ষর নবীর কন্ঠ থেকে হচ্ছে তা তিনি অহী ছাড়া অন্য

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

এরা বলে, "কেনইবা এই ব্যক্তির ওপর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হয়নি[৯০] এর রবের পক্ষ থেকে?" বলো, "নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং আমি কেবলমাত্র পরিষ্কারভাবে সতর্ককারী।" আর এদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়?[৯১] আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসিহত।[৯২]

কোন উপায়ে অর্জন করতে পারতেন না। যদি তিনি লেখাপড়া জেনে থাকতেন এবং লোকেরা কখনো তাঁকে বই পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো তাহলে তো অবশ্যই বাতিলপন্থীদের জন্য এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন ভিত্তি থাকতো যে, এসব জ্ঞান অহীর মাধ্যমে নয় বরং জাগতিক মেধা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা তো তাঁর সম্পর্কে নামমাত্র কোন সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ ও ভিত্তিও অবশিষ্ট রাখেনি। এখন নিছক হঠকারিতা ছাড়া তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করার আর এমন কোন কারণই নেই যাকে কোন পর্যায়েও যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে।

৮৯. অর্থাৎ একজন নিরক্ষরের পক্ষে কুরআনের মতো একটি কিতাব পেশ করা এবং সহসা এমনসব অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটানো যেগুলোর জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আয়োজন কখনো কারো চোখে পড়েনি, এগুলোই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ পেশকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন। দুনিয়ার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে যারই অবস্থা পর্যালোচনা করা যাবে, তারই নিজস্ব পরিবেশে মানুষ এমনসব উপাদানের সন্ধান লাভ করতে পারবে যেগুলো তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক পাওয়া যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে যেসব বিস্ময়কর গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তার কোন উৎস তাঁর পরিবেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানের সাথে কোন প্রকার দূরবর্তী সম্পর্ক রাখে এমনসব উপাদান সেকালে আরবীয় সমাজের এবং আশপাশে যেসব দেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক ছিল তাদের সমাজের কোথাও থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতার ভিত্তিতেই এখানে বলা

হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা একটি নিদর্শনের নয় বরং বহু নিদর্শনের সমষ্টি। মূর্খ এর মধ্যে কোন নিদর্শন দেখতে পায় না, এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা এ নিদর্শনগুলো দেখে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কেবলমাত্র একজন নবীই এ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন।

৯০. অর্থাৎ মু'জিযা, যেগুলো দেখে বিশ্বাস করা যায় সত্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নবী।

৯১. অর্থাৎ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি কুরআনের মতো একটি কিতাব নাযিল হওয়া, এটি তোমাদের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট হবার মতো বড় মু'জিযা নয় কি? এর পরও কি আর কোন মু'জিযার প্রয়োজন থাকে? অন্য মু'জিযাগুলোতো যারা দেখেছে তাদের জন্য মু'জিযা ছিল কিন্তু এ মু'জিযাটি তো সর্বক্ষণ তোমাদের সামনে রয়েছে, প্রতিদিন তোমাদের পড়ে শুনানো হচ্ছে। তোমরা সবসময় তা দেখতে পারো।

কুরআন মজীদের এ যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পরও যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাদের দুঃসাহস দেখে অবাক হতে হয়। অথচ এখানে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় নবী করীমের (সা) নিরক্ষর হবার বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে পেশ করছে। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে নবী করীম (সা) সাক্ষর ছিলেন অথবা পরে লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে দাবী করা হয়, সেগুলো তো প্রথম দৃষ্টিতেই প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। কারণ কুরআন বিরোধী কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারপর এগুলো নিজেই এত দুর্বল যে, এগুলোর ওপর কোন যুক্তির ভিত্ খাড়া করা যেতে পারে না। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বুখারীর একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে : হুদাইবিয়ার চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় যখন চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেরদের প্রতিনিধিরা রসূলে করীমের (সা) নামের সাথে রসূলুল্লাহ লেখার ওপর আপত্তি জানায়। তখন নবী (সা) চুক্তি লেখককে (অর্থাৎ হযরত আলী) নির্দেশ দেন, ঠিক আছে 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে তার জায়গায় লেখো 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ'। হযরত আলী (রা) 'রসূলুল্লাহ' শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন। নবী করীম (সা) তাঁর হাত থেকে কলম নিয়ে নিজেই শব্দটি কেটে দেন এবং 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখে দেন।

কিন্তু এ হাদীসটি বারাআ ইবনে আযিব থেকে বুখারীতে চার জায়গায় এবং মুসলিমে দু'জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর শব্দাবলী বিভিন্ন।

এক : বুখারী চুক্তি অধ্যায়ে এর শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

قال لعلى امحه فقال على ما انا بالذى امحاه فمحاه رسول الله بيده –

"নবী করীম (সা) আলীকে বললেন এ শব্দগুলো কেটে দাও। আলী বললেন, আমি তো কেটে দিতে পারি না। শেষে নবী করীম (সা) নিজ হাতে তা কেটে দেন।"

দুই : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে :

ثم قال لعلى امح رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا فاخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله

"তারপর আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কেটে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো আপনার নাম কাটবো না। শেষে নবী করীম (সা) দলীলটি নিয়ে লিখলেন, "এটি সেই চুক্তি যা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্পাদন করেছেন।"

তিন : তৃতীয় হাদীসও বারাআ ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম বুখারী এটি জিযিয়া অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন :

وكان لا يكتب فقال لعلى امح رسول الله فقال على والله لا امحاه ابدا قال فارنيه قال فاراه اياه فمحاه النبى صلى الله عليه وسلم بيده -

"নবী করীম (সা) নিজে লিখতে পারতেন না। তিনি হযরত আলীকে বললেন, রসূলুল্লাহটা কেটে দাও। আলী বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এ শব্দগুলো কখনোই কাটবো না। একথায় নবী করীম (সা) বলেন, যেখানে এ শব্দগুলো লেখা আছে সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তিনি তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে সে শব্দগুলো কেটে দিলেন।

চার : চতুর্থ হাদীসটি বুখারীর যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়ে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله

"কাজেই নবী করীম (সা) সে দলীলটি নিয়ে নিলেন অথচ তিনি লিখতে জানতেন না এবং তিনি লিখলেন। এটি সেই চুক্তি যেটি স্থির করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।"

পাঁচ : একই বর্ণনাকারী বারাআ ইবনে আযিব থেকে মুসলিমের কিতাবুল জিহাদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, নবী করীম (সা) আলীর অস্বীকৃতির কারণে নিজের হাতে "আল্লাহর রসূল" শব্দ কেটে দেন।

ছয় : এ কিতাবে অন্য একটি হাদীস একই বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বলেন, রসূলুল্লাহ শব্দ কোথায় লেখা আছে আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী তাঁকে জায়গাটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি সেটি বিলুপ্ত করে আবদুল্লাহর পুত্র লিখে দেন।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى
لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ
بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৬ রুকূ'

(হে নবী!) বলো, "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে সবকিছু জানেন। যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

এরা তোমার কাছে দাবী করছে আযাব দ্রুত আনার জন্য।[৯৩] যদি একটি সময় নির্ধারিত না করে দেয়া হতো, তাহলে তাদের ওপর আযাব এসেই যেতো এবং নিশ্চিতভাবেই (ঠিক সময় মতো) তা অকস্মাত এমন অবস্থায় এসে যাবেই যখন তারা জানতেও পারবে না। এরা তোমার কাছে আযাব দ্রুত আনার দাবী করছে অথচ জাহান্নাম এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে নিয়েছে (এবং এরা জানতে পারবে) সেদিন যখন আযাব এদেরকে ওপর থেকে ঢেকে ফেলবে এবং পায়ের নিচে থেকেও আর বলবে, যেসব কাজ তোমরা করতে এবার তার মজা বোঝো।

উল্লেখিত হাদীসগুলোর বর্ণনার মধ্যে যে অস্থিরতা ফুটে উঠেছে তা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, মাঝখানের বর্ণনাকারীরা হযরত বারাআ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর শব্দগুলো হুবহু উদ্ধৃত করেননি। তাই তাদের কারো একজনের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলা যেতে পারে না যে, নবী করীম (সা) "মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ" শব্দগুলো নিজ হাতেই লেখেন। হতে পারে, সঠিক ঘটনা হয়তো এ রকম ছিল ঃ যখন হযরত আলী "রসূলুল্লাহ" শব্দ কেটে দিতে অস্বীকার করেন তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে সে জায়গাটি জিজ্ঞেস করে নিয়ে নিজের হাতে সেটি

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো। আমার যমীন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা আমারই বন্দেগী করো।[৯৪] প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে[৯৫] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতইনা উত্তম প্রতিদান কর্মশীলদের জন্য[৯৬] —তাদের জন্য যারা সবর করেছে[৯৭] এবং যারা নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে।[৯৮] কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৯৯]

কেটে দেন এবং তারপর তাঁর সাহায্যে বা অন্য কোন লেখকের সহায়তায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ শব্দ লিখে দিয়ে থাকবেন। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় দু'জন লেখক চুক্তিনামা লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, এদের একজন ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং অন্যজন ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (ফাতহুল বারি, ৫ খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)। কাজেই একজন লেখক যে কাজ করেননি দ্বিতীয়জন যে তা করেছেন, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। তবুও যদি বাস্তবেই এটা ঘটে থাকে যে, নবী করীম (সা) নিজের নাম নিজের পবিত্র হাতে লিখে দিয়েছেন, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। দুনিয়ায় এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, একজন নিরক্ষর লোক শুধুমাত্র নিজের নামটি লেখা শিখে নিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই লিখতে পড়তে পারে না।

অন্য যে হাদীসটির ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষর দাবী করা হয়ে থাকে সেটি মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শাইবা এবং আমর ইবনে শুবাহ উদ্ধৃত করেছেন। তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ

"ইন্তিকালের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন।"

কিন্তু প্রথমত সনদের দিক দিয়ে এটি অত্যন্ত দুর্বল রেওয়ায়াত, যেমন হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, ضعيف لا اصل له (অর্থাৎ এটি দুর্বল রেওয়ায়াত, এর কোন ভিত্তি নেই।)। দ্বিতীয়ত এর দুর্বলতাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ যদি নবী করীম (সা) পরবর্তী পর্যায়ে লেখাপড়া শিখে থাকেন, তাহলে এটা সাধারণ্যে প্রচারিত হবার কথা। বহু সংখ্যক সাহাবী এ বিষয়টি বর্ণনা করতেন। এই সংগে নবী করীম (সা) কার কাছে বা কার কার কাছে লেখাপড়া শিখেছেন তাও জানা যেতো। কিন্তু একমাত্র মুজাহিদ যার কাছ থেকে একথা শুনেন সেই আওন ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ একথা বর্ণনা করেননি। আর এই আওনও সাহাবী নন। বরং তিনি একজন তাবেঈ। কোন্ সাহাবী বা কোন্ কোন্ সাহাবী থেকে তিনি একথা শুনেছেন তাও তিনি ঘুণাক্ষরেও বলেননি। একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের দুর্বল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এমন কোন কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যা অত্যন্ত সুপরিচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ঘটনার বিরোধিতা করে।

৯২. অর্থাৎ নিসন্দেহে এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর মহা অনুগ্রহ স্বরূপ। এর মধ্যে রয়েছে বান্দার জন্য বিপুল পরিমাণ উপদেশ ও নসিহত। কিন্তু এ থেকে একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে যারা এর প্রতি ঈমান আনে।

৯৩. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জের কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাকো এবং আমরা যথার্থই সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকি, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় আমাদের দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে আসছো না কেন?

৯৪. এখানে হিজরাতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যদি মক্কায় আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে বসবাস করতে পারো সেখানে চলে যাও। তোমাদের জাতি ও দেশের নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। এ থেকে জানা যায়, আসল জিনিস জাতি ও দেশ নয় বরং আল্লাহর বন্দেগী। যদি কখনো জাতি ও দেশ প্রেমের দাবী এবং আল্লাহর বন্দেগীর দাবীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে তাহলে সেটিই হয় মু'মিনের ঈমানের পরীক্ষার সময়। যে সাচ্চা মু'মিন হবে, সে আল্লাহর বন্দেগী করবে এবং দেশ ও জাতিকে পরিত্যাগ করবে। আর যে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার হবে, সে ঈমান পরিত্যাগ করবে এবং নিজের দেশ ও জাতিকে আঁকড়ে ধরবে। এ আয়াতটি এ ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট যে, একজন সত্যিকার আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ ও জাতি পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহর বন্দেগী হয় সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে সে এর কাছে বিকিয়ে দেয় কিন্তু দুনিয়ার কোন জিনিসের কাছে একে বিকিয়ে দেয় না।

৯৫. অর্থাৎ প্রাণের কথা ভেবো না। এ তো কখনো না কখনো চলে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য কেউই দুনিয়ায় আসেনি। কাজেই এ দুনিয়ায় কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে এটা তোমাদের জন্য কোন চিন্তাযোগ্য বিষয় নয়। বরং আসল চিন্তাযোগ্য বিষয় হচ্ছে,

ঈমান কেমন করে বাঁচানো যাবে এবং আল্লাহর আনুগত্যের দাবী কিভাবে পূরণ করা যাবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের ফিরে আমার দিকে আসতে হবে। যদি দুনিয়ায় প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঈমান হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর ফল হবে ভিন্ন কিছু। আর ঈমান বাঁচাবার জন্য যদি প্রাণ হারিয়ে চলে আসো তাহলে এর পরিণাম হবে অন্য রকম। কাজেই আমার কাছে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিয়ে ফিরে আসবে, কেবল একথাটিই চিন্তা করো। প্রাণের জন্য উৎসর্গীত ঈমান, না ঈমানের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ নিয়ে?

৯৬. অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক যদি ঈমান ও নেকীর পথে চলে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিতও হয়ে যাও এবং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুবি ব্যর্থতার মৃত্যু বরণও করে থাকো তাহলে বিশ্বাস করো অবশ্যই এ ক্ষতিপূরণ হবে এবং নিছক ক্ষতিপূরণই হবে না বরং সর্বোত্তম প্রতিদানও পাওয়া যাবে।

৯৭. অর্থাৎ যারা সব রকমের সমস্যা, সংকট, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবিলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যারা ঈমান আনার বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ঈমান ত্যাগ করা, উপকারিতা ও মুনাফা যারা নিজের চোখে দেখেছে এবং এরপরও তার প্রতি সামান্যতমও ঝুঁকে পড়েনি। যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি।

৯৮. অর্থাৎ যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, কাজ-করবার ও বংশ-পরিবারের ওপর ভরসা করেনি বরং নিজেদের রবের ওপর ভরসা করেছে। যারা দুনিয়াবী উপায়-উপাদানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজেদের রবের ভরসায় ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করার এবং প্রয়োজনে প্রত্যেকটি শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান তাঁর কাছে কখনো নষ্ট হবে না এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি নিজের মু'মিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এ দুনিয়ায় সহায়তা দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কার্যক্রমের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

৯৯. অর্থাৎ হিজরাত করার ব্যাপারে তোমাদের প্রাণের চিন্তার মতো জীবিকার চিন্তায়ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়। তোমাদের চোখের সামনে এই যে অসংখ্য পশুপাখি ও জলজপ্রাণী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তার জীবিকা বহন করে ফিরছে? আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোন না কোন প্রকারে জীবিকা লাভ করেই থাকে। কাজেই তোমরা একথা ভেবে সাহস হারিয়ে বসো না যে, যদি ঈমান রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ি তাহলে খাবো কি? আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদেরও দেবেন। ঠিক একথা সাইয়িদিনা মসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর সাথীদেরকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয়ত একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۖ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

যদি[১০০] তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ, এরপর এরা প্রতারিত হচ্ছে কোন্ দিক থেকে? আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন। আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত পতিত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য[১০১] কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না।

তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর? তাহারা বুনেওনা, কাটেওনা, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানূড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে, সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটেনা; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চূলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব?' বা কি 'পান করিব?' বা 'কি পরিব?' কেননা পরজাতীয়েরাই এ সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা–ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭ রুকূ'

আর এ দুনিয়ার জীবন একটি খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০২] আসল জীবনের গৃহতো হচ্ছে পরকালীন গৃহ, হায়! যদি তারা জানতো।[১০৩] যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে তখন নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে ভিড়িয়ে দেন তখন সহসা তারা শিরক করতে থাকে, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত নাজাতের ওপর তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করতে এবং দুনিয়ার জীবনের মজা ভোগ করতে পারে।[১০৪] বেশ, শিগ্গীর তারা জেনে যাবে।

রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট ।"

(মথি ৬ ঃ ২৪–৩৪)

কুরআন ও বাইবেলের এ উক্তিগুলোর পটভূমি অভিন্ন। সত্যের দাওয়াতের পথে এমন একটি পর্যায় এসে যায় যখন একজন সত্যপ্রিয় মানুষের জন্য উপকরণের জগতের সমস্ত সহায় ও নির্ভরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিছক আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ অবস্থায় যারা অংক কষে ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে এবং পা বাড়াবার আগে প্রাণরক্ষা ও জীবিকা উপার্জনের নিশ্চয়তা খুঁজে বেড়ায় তারা কিছুই করতে পারে না। আসলে এ ধরনের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এমন সব লোকের শক্তির জোরে যারা প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সব ধরনের বিপদ মাথা পেতে নেবার জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। তাদেরই ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসে যখন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হয়ে যায় এবং তার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত মত পথ অবনমিত হয়।

১০০. এখান থেকে আবার মক্কার কাফেরদের প্রতি বক্তব্যের মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

তারা কি দেখে না, আমি একটি নিরাপদ হারম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশেপাশে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?[১০৫] এরপরও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে? তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে, যখন তা তার সামনে এসে গেছে?[১০৬] জাহান্নামই কি এ ধরনের কাফেরদের আবাস নয়? যারা আমার জন্য সংগ্রাম–সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো।[১০৭] আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই সাথে আছেন।

১০১. এখানে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" শব্দগুলোর দু'টি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব যখন আল্লাহরই কাজ তখন একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। অন্যেরা প্রশংসালাভের অধিকার অর্জন করলো কোথায় থেকে? দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর শোকর, তোমরা নিজেরাও একথা স্বীকার করছো।

১০২. অর্থাৎ এর বাস্তবতা শুধুমাত্র এতটুকুই যেমন ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য নেচে গেয়ে আমোদ করে এবং তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। এখানে যে রাজা হয়ে গেছে সে আসলে রাজা হয়ে যায়নি বরং শুধুমাত্র রাজার অভিনয় করছে। এক সময় তার এ খেলা শেষ হয়ে যায়। তখন সে ঠিক তেমনি দীনহীন অবস্থায় রাজ সিংহাসন থেকে বিদায় নেয় যেভাবে এ দুনিয়ার বুকে এসেছিল। অনুরূপভাবে জীবনের কোন একটি আকৃতিও এখানে স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। যে যে অবস্থায়ই আছে সাময়িকভাবে একটি সীমিত সময়কালের জন্যই আছে। মাত্র কয়েকদিনের জীবনের সাফল্যের জন্য যারা প্রাণপাত করে এবং এরি জন্য বিবেক ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু আয়েশ আরামের উপকরণ ও শক্তি–প্রতিপত্তির জৌলুস করায়ত্ত করে নেয়, তাদের এ সমস্ত কাজ মন ভুলানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব খেলনার সাহায্যে তারা যদি দশ, বিশ বা ষাট সত্তর বছর মন ভুলানোর কাজ করে থাকে এবং তারপর শূন্য হাতে মৃত্যুর দরোজা অতিক্রম করে এমন জগতে পৌঁছে যায় যেখানকার স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনে তাদের এ খেলা এক প্রতিকারহীন রোগে পরিণত হয়, তাহলে এ ছেলে ভুলানোর লাভ কি?

১০৩. অর্থাৎ যদি তারা একথা জানতো, এ দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার অবকাশ মাত্র এবং মানুষের জন্য আসল জীবন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাহলে তারা এখানে পরীক্ষার সময়–কালকে খেলা–তামাশায় নষ্ট না করে এর প্রতিটি মুহূর্ত এমনসব কাজে ব্যবহার করতো যা সেই চিরন্তন জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হতো।

১০৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম , ২৯ ও ৪১; সূরা ইউনুস, ২৯ ও ৩১ এবং সূরা বনী ইসরাঈল, ৮৪ টীকা।

১০৫. অর্থাৎ তারা যে মক্কা শহরে বাস করে, যে শহরে তারা পূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন করছে, কোন লাত বা হুবল কি একে হারম তথা নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছে? আরবের আড়াই হাজার বছরের চরম অশান্তি ও নৈরাজ্যের পরিবেশে এ স্থানটিকে সকল প্রকার বিশৃংখলা ও বিপর্যয় মুক্ত রাখা কি কোন দেবতা বা দেবীর সাধ্যায়ত্ত ছিল? আমি ছাড়া আর কে এর মর্যাদা রক্ষাকারী ছিল?

১০৬. অর্থাৎ নবী রিসালাতের দাবী করেছেন এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। এখন বিষয়টি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। নবী যদি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি তোমরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকো, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই।

১০৭. "সংগ্রাম–সাধনার" ব্যাখ্যা এ সূরা আনকাবুতের ৮ টীকায় করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সংগ্রাম–সাধনা করবে সে নিজের ভালোর জন্য করবে (৬ আয়াত)। এখানে এ নিশ্চিন্ততা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে সারা দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষের বিপদ মাথা পেতে নেয় তাদেরকে মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদের হাত ধরেন, তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। পথের প্রতিটি বাঁকে তিনি তাদেরকে আলো দেখান। যার ফলে কোন্‌টা সঠিক পথ ও কোন্‌টা ভুল পথ তা তারা দেখতে পায়। তাদের নিয়ত যতই সৎ ও সদিচ্ছা প্রসূত হয় ততই আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ–সুবিধা প্রদান ও হিদায়াতও তাদের সহযোগী হয়।